তফসিলীরা
গান্ধিজী থেকে সাবধান!

ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের

WHAT CONGRESS AND GANDHI HAVE DONE TO THE UNTOUCHABLES?

গ্রন্থের দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ

ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী

তফসিলীরা গান্ধিজী থেকে সাবধান!

ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের
WHAT CONGRESS AND GANDHI HAVE DONE TO THE UNTOUCHABLES ?
গ্রন্থ থেকে বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ করেছেন—
রণজিত কুমার সিকদার

"আমি সারাজীবন অবহেলিত তফসিলী সমাজের উন্নতির চেষ্টা করে হলাম সাম্প্রদায়িক ও দুরাত্মা; আর গান্ধিজী অস্পৃশ্য তফসিলী সমাজকে ধোঁকা দিয়ে হলেন জাতির জনক ও মহাত্মা।"

—মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী

TAFSHILIRA GANDHIJI THEKE SABDHAN ! Rs. 8·00

Published by Dr. Ambedkar Prakashani
Publisher : Sm. Renu Sikdar
P.O. + Vill.—Dhalua, Dt. S-24—Parganas
Pin—743516, West Bengal, Phone—462-0440

ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনীর পক্ষে
প্রকাশিকা : শ্রীমতী রেণু সিকদার
গ্রাম ও পোস্ট—ঢালুয়া, জিলা—দঃ ২৪ পরগণা,
পিন—৭৪৩৫১৬

প্রথম প্রকাশ : ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫

মুদ্রাকর : মুক্তিমোহন ঘোষ
ঘোষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৯ এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রাপ্তিস্থান : ১। রণজিত কুমার সিকদার
গ্রাম ও পোষ্ট—ঢালুয়া, জিলা—দঃ ২৪ পরগণা,
পিন—৭৪৩৫১৬
(গড়িয়া রেল স্টেশন থেকে পূর্বদিকে ৫ মিনিটের পথ)
২। আম্বেদকর ভবন
৩৮ বি, স্কট লেন, শিয়ালদহ, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য—আট টাকা মাত্র

ভূমিকা

'তফসিলীরা গান্ধিজী থেকে সাবধান!' পুস্তিকাটি ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের সুপরিচিত 'What Congress And Gandhi Have Done To The Untouchables ?' গ্রন্থটির দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ।

'তফসিলী' নামটির সৃষ্টি হয়েছে ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' চালু হওয়ার পর থেকে। তার আগে তফসিলী শ্রেণীর অনেক নাম ছিল যেমন—অস্পৃশ্য শ্রেণী, নির্যাতিত শ্রেণী, অনুন্নত শ্রেণী প্রভৃতি। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর এই গ্রন্থে তফসিলী শ্রেণীকে অস্পৃশ্য নামে অভিহিত করেছেন। তাই অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য নামটি ব্যবহৃত হলেও আসলে তারা তফসিলী শ্রেণী।

গান্ধিজী আবার আদর করে তাদের নাম দিয়েছিলেন 'হরিজন'। হরিজন কথাটির তাৎপর্য হল পিতৃপরিচয়হীন সন্তান। হিন্দু সমাজে মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসী প্রথা প্রচলিত। দেবদাসীরা হল মন্দিরের দেবতার পরিণীতা স্ত্রী; তাই তাদের সন্তানরা হল হরিজন অর্থাৎ দেবতার সন্তান। আসলে দেবতার নামে মন্দিরে পুরোহিত-পাণ্ডারাই দেবদাসীদের উপভোগ করে থাকে এবং তাদের ঔরসজাত সন্তানরা পিতৃপরিচয়হীন হয়ে দেবতার সন্তান অর্থাৎ হরিজন নামে পরিচিত হয়। মহানুভব গান্ধিজী তফসিলী সমাজকে দয়াপরবশ হয়ে 'হরিজন' অর্থাৎ জারজ সন্তান নামে অভিহিত করেছেন।

এই গ্রন্থটিতে ডঃ বি. আর. আম্বেদকর গান্ধিজীর জীবনী ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, তিনি সারাজীবন তফসিলী অর্থাৎ নির্যাতিত বা অস্পৃশ্য সমাজকে তাদের কল্যাণের নামে কিভাবে প্রবঞ্চিত করে গেছেন।

গান্ধিজীর জীবিত থাকাকালেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু তিনি ডঃ আম্বেদকরের একটি অভিযোগও খণ্ডন করতে পারেন নি। তফসিলী সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ নিরক্ষর থাকায় এবং মূল গ্রন্থটি ইংরাজীতে লিখিত হওয়ার ফলে গান্ধিজীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ জনসাধারণের গোচরীভূত হয় নি। পক্ষান্তরে তারা কংগ্রেসী প্রচার যন্ত্রের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি গ্রন্থটি পাঠ করলে কংগ্রেস ও গান্ধিজী সম্পর্কে তফসিলী সমাজের মোহভঙ্গ হবে।

মূল গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আমরা অনেক আগে প্রকাশ করলেও দরিদ্র পাঠকদের সুবিধার্থে গান্ধিজী ও কংগ্রেসের কার্যাবলী ছোট ছোট অংশে

পৃথক পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছি। তফসিলীরা এর থেকে কংগ্রেস ও গান্ধিজীর আসল চরিত্রটি অনুধাবন করলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। জয় ভীম! জয় ভারত!!

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫
ঢালুয়া, দঃ ২৪ পরগণা

বিনীত,
রণজিতকুমার সিকদার

তফসিলীরা গান্ধিজী থেকে সাবধান!

১

কংগ্রেসীরা তফসিলী অর্থাৎ অস্পৃশ্যদের কাছে এই কথাটাই সর্বদা প্রচার করে চলছে যে, গান্ধিজী তাদের মুক্তিদাতা। তারা শুধু একথা প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকে নি; তারা অস্পৃশ্যদের একথা বিশ্বাস করাতে চেয়েছে যে, গান্ধিজী হলেন তাদের একমাত্র মুক্তি-দাতা। যখন প্রমাণ চাওয়া হয়েছে তখনই তারা নির্দ্বিধায় বলেছে যে, একমাত্র গান্ধিজীই অস্পৃশ্যদের স্বার্থে আমরণ অনশন করতে চেয়েছেন; আর কেউ তা করেন নি। বিন্দুমাত্র বিবেকদংশন অনুভব না করেই তারা অস্পৃশ্যদের বলছে—পুনা-চুক্তির মাধ্যমে অস্পৃশ্যরা যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে সবটাই গান্ধিজীর অবদান। এরূপ প্রচারের উদাহরণ হিসাবে ১৯৪৫ সালের ১২এপ্রিল তারিখে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত অস্পৃশ্যদের একটি সভায় রায়বাহাদুর মেহেরচাঁদ খান্নার বক্তৃতাটি তুলে ধরা হল:—

"আপনাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু মহাত্মা গান্ধী আপনাদের স্বার্থে পুনাতে অনশন করেন—যার ফলে পুনাচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং আপনারা আইনসভায়, স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোটাধিকার লাভ করেন। আমি জানি আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ ডঃ আম্বেদ-করকে সমর্থন করছেন, যিনি হলেন একজন বৃটিশের এজেণ্ট এবং যার উদ্দেশ্য হল বৃটিশ সরকারের হাতকে শক্ত করা—যাতে ভারত ভাগ হয় এবং বৃটিশ শাসন স্থায়ী হয়। আমি আপনাদের বৃহত্তম স্বার্থের দিকে তাকিয়ে আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি যে, কে আপনাদের প্রকৃত বন্ধু এবং কে স্বঘোষিত নেতা তা আপনারা চিনে নিন।"

আমি মেহেরচাঁদ খান্নার বক্তৃতা উদ্ধৃত করছি তার অর্থ এই নয় যে, তিনি একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তার মত কুখ্যাত ব্যক্তি সারা ভারতে হয়ত দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া যাবে না। বিগত এক বছরের মধ্যে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে তিনটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি রাজনীতি সুরু করেন হিন্দু মহাসভার সম্পাদক হিসাবে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই বৃটিশ সরকারের এজেণ্ট

হয়ে বিদেশে বৃটিশ সরকারের হয়ে যুদ্ধের সমর্থনে প্রচারে বেরোলেন। এখন তিনি হচ্ছেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের এজেণ্ট। রায়বাহাদুর খান্না সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে মনে পড়ে ড্রাইডেনের কথা। তিনি এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন—যিনি একপক্ষ কালের মধ্যে কখনো রসায়ণবিদ, কখনো বেহালাবাদক, কখনো রাজ-নীতিবিদ এবং কখনো ভাঁড়। খান্নাসাহেব ঘৃণার পাত্র হিসাবেও অযোগ্য। তবে তার নাম উল্লেখ করা হল কেবলমাত্র কংগ্রেসীরা অস্পৃশ্যদের বিভ্রান্ত করার জন্য কি ধরণের মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে তার কিছু নমুনা হিসাবে।

আমি জানি না কত সংখ্যক অস্পৃশ্য কংগ্রেসের এই ধরণের মিথ্যা প্রচারের শিকার হবে। তবে হিটলারের নাজি বাহিনীর দৃষ্টান্ত থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, কোন মিথ্যা যদি বৃহৎ আকারের হয় যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজে বোধগম্য নয় এবং তা যদি পুনঃ পুনঃ সত্য বলে প্রচার করা হয়, তবে অনেকে তাকে সত্য বলে ধরে নিতে পারে। তাই আমার পক্ষে গান্ধিজীর আসল ভূমিকাটি অস্পৃশ্যদের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন, যাতে তারা কংগ্রেসের মিথ্যা প্রচারের শিকার না হয়।

২

গান্ধিজীর ভূমিকা সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গেলে এটা আমা-দের জানা দরকার কখন গান্ধিজীর প্রথম বোধগম্য হল যে, অস্পৃশ্যতা একটি সামাজিক ব্যাধি। এ সম্পর্কে আমরা তাঁর নিজস্ব বক্তব্যটা শুনি। ১৯২১ সালের ১৪ ও ১৫ এপ্রিল আমেদাবাদে অস্পৃশ্য সমাজের একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গান্ধিজী সভাপতি হিসাবে বলেন ঃ—

"অস্পৃশ্যতা ব্যাপারটা যখন প্রথম আমার নজরে এল তখন আমার বয়স বড় জোর ১২ বছর। উখা নামে একজন জমাদার আমাদের বাড়ীতে পায়খানা পরিষ্কার করতে আসত। আমি প্রায়ই আমার মাকে জিজ্ঞাসা করতাম তোমরা কেন আমাকে ওকে ছুঁতে বারণ করছ ? ওকে ছুঁয়ে দিলে আমার কি ক্ষতি হবে ? যদি কখনো

আমি উথাকে ছুঁয়ে ফেলতাম তখন আমাকে স্নান করতে হত। আমি পিতামাতার অত্যন্ত অনুগত সন্তান ছিলাম। তবুও তাদের সঙ্গে এবিষয়ে আমার বাগ-বিতণ্ডা হত। আমি মাকে বলতাম যে, উথাকে স্পর্শ করাতে কোন পাপ হয়েছে বলে মনে করি না।

"স্কুলে পড়ার সময় আমি প্রায়ই অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করতাম। একথা আমি মার কাছে গোপন করতাম না। তখন মা আমার দৈহিক অপবিত্রতা দূর করার জন্য একটা সহজ পথ বের করেছিলেন যে, আমি যেন কোন পথচারী মুসলমানকে ছুঁয়ে আসি। যেহেতু মা বলতেন আমিও তাই করতাম ; যদিও আমার তাতে কোন বিশ্বাস ছিল না। কিছুদিন পরে আমরা পোরবন্দরে গেলাম। সেখানে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমার ভাই ও আমাকে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে শিক্ষা লাভ করতে দেওয়া হল। তিনি আমাদের 'রামরক্ষা' ও 'বিষ্ণুপঞ্জর' শিখাতেন। 'জলে-বিষ্ণু' ও 'স্থলে বিষ্ণু' নামক দুইখানি বই মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। আমাদের বাড়ীর পাশেই এক বৃদ্ধা মহিলা থাকতেন। আমি তখন অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির ছিলাম। অন্ধকার হলেই আমি ভূতের ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়তাম। সেই বৃদ্ধা মহিলা আমাকে বললেন—যখন তোমার ভয় পাবে তখনই তুমি 'রামরক্ষা' থেকে কয়েকটি পদ আবৃত্তি করতে থাকবে, দেখবে ভয় চলে গেছে। তার কথা পালন করে আমি ভাল ফল পেলাম। আমার বেশ মনে আছে যে 'রামরক্ষা'তে এমন কোন পদ ছিল না যাতে বলা হয়েছে যে, অস্পৃশ্যতা পাপ। যে 'রামরক্ষা' ভূতের ভয় দূর করতে পারে সে কখনো অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করার ভয়কে সমর্থন করতে পারে না।

"আমাদের পরিবারে প্রতিদিন রামায়ণ পাঠ করা হত। লাধা মহারাজ নামক এক ব্যক্তি রামায়ণ পাঠ করতেন। তার ছিল কুষ্ঠ ব্যাধি এবং তার বিশ্বাস ছিল যে রামায়ণ পাঠ করলে তার কুষ্ঠ দূর হবে। শেষ পর্যন্ত কুষ্ঠ থেকে সে আরোগ্য লাভ করেছিল। আমি এটা স্থির বুঝেছিলাম—যে রামায়ণে রাম অস্পৃশ্যের নৌকায় নদী পার হয়েছিলেন, সেই রামায়ণ কি করে অস্পৃশ্যদের অপবিত্র বলে সমর্থন করতে পারে ? আমরা ভগবান সম্পর্কে বলি তিনি অপবিত্রকে

পবিত্র করেন ; অথচ সেই ভগবানের সৃষ্ট কোন একটা পরিবারে জন্মগ্রহণকারীকে কি করে অস্পৃশ্য বলে মনে করতে পারি ? তাই আমি অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলে মনে করি না। তবে আমি একথাও বলব না যে, আমি সেই ১২ বছর বয়সেই অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলে মনে করতাম না। বৈষ্ণব এবং গোঁড়া হিন্দুদের জ্ঞাতার্থে আমি এই কাহিনীটি বর্ণনা করলাম।”

উপরের বর্ণনা থেকে বোঝা গেল যে মাত্র ১২ বছর বয়সে গান্ধিজী অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। এখন অস্পৃশ্যরা যে কথাটি জানতে চাইছে তা হল, একথা জানার পর অস্পৃশ্যতা ব্যাধি দূর করার জন্য গান্ধিজী কি করলেন ? এ ক্ষেত্রে ১৯২২ সালে প্রকাশিত গান্ধিজীর জীবনীমূলক গ্রন্থ ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’র ভূমিকায় মাদ্রাজের প্রকাশক ‘ট্যাগোর এ্যাণ্ড কোম্পানী’ যে কথা লিখেছে তার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ—

“মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে বেনিয়া। পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী। তিনি ছিলেন পোরবন্দর, রাজকোট ও কাথিওয়াড়ের দেওয়ান। গান্ধিজী ‘কাথিওয়াড় হাই স্কুলে’ শিক্ষা লাভ করেন ; পরে ‘লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে’ এবং শেষে ‘ইনার টেম্পলে’। লণ্ডন থেকে ফিরে এসে বোম্বাই হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট হিসাবে নাম রেজিস্ট্রী করেন। কিছুদিন পরে তিনি আফ্রিকার নাটাল ও ট্রান্সভালে আইনসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য যান এবং নাটাল সুপ্রিম কোর্টে এ্যাড-ভোকেট হিসাবে নাম রেজিস্ট্রী করেন। সেখানে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ‘নাটাল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস’ গঠন করেন। ১৮৯৫ সালে ভারতে আসেন এবং নাটাল ও ট্রান্সভাল-স্থিত ভারতীয়দের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তারপর ডারবানে ফিরে যান। ফেরার মুহূর্তেই তিনি সেখানে আক্রান্ত হন এবং অল্পের জন্য বেঁচে যান। পরে বুয়র যুদ্ধের সময় তিনি ‘ভারতীয় এ্যাম্বুলেন্স বাহিনী’ পরিচালনা করেন। ১৯০১ সালে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ভারতে আসেন। পরে আবার ফিরে যান। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের দুর্দশার প্রতিকারের জন্য মিঃ চেম্বারলেনের কাছে ডেপুটেশন দেন। তিনি ট্রান্সভালের

সুপ্রিম কোর্টে নাম রেজিস্ট্রী করেন এবং 'ট্রান্সভাল ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' তৈরীকরে তার অনারারী সেক্রেটারী ও আইন বিষয়ক প্রধান পরামর্শদাতা হন। ১৯০৩ সালে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৬ সালে 'স্ট্রেচার বহনকারী বাহিনী' গঠন করেন। আইন অমান্য করার জন্য তিনি ২ বার জেল খাটেন। ১৯০৯ সালে ভারতীয়দের বিষয় ব্রিটেনের জনসমক্ষে তুলে ধরবার জন্য দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ড যান। ১৯১৪ সালে 'ভারতীয় এ্যামবুলেন্স বাহিনী' গঠন করেন।"

উল্লিখিত জীবনী সংক্রান্ত বিবরণ থেকে এটা বোঝা গেল যে, গান্ধিজী ১৮৯৪ থেকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকাতে ছিলেন। এই দীর্ঘ ২১ বছরের মধ্যে তিনি অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে কোন খোঁজখবর রাখেন নি। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করলেন কি? পূর্বোক্ত ভূমিকা থেকে আরো একটু বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাক ঃ—

"তিনি ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে এলেন। আমেদাবাদে 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' স্থাপন করলেন। ১৯১৭ সালে চম্পারণ শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন। ১৯১৮ সালে দুর্ভিক্ষের প্রতিকার এবং আমেদাবাদে শ্রমিক ধর্মঘটের কাজে নামলেন। ১৯১৯ সালে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে লাগলেন। দিল্লীর পথে কোশীতে গ্রেপ্তার হলেন এবং বোম্বাইতে প্রেরিত হলেন। পাঞ্জাবে অরাজকতা দেখা দিল। খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করলেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন সুরু করলেন। ১৯২১ সালের মে মাসে লর্ড রীডিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ১৯২১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেসকে পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত হল। ১৯২২ সালে গণ আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু হল এবং চৌরিচোরাতে দাঙ্গার পরি-প্রেক্ষিতে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল। ১৯২২ সালের মার্চে গ্রেপ্তার হলেন এবং ৬ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।"

এই ভূমিকায় এই সময়কালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বাদ পড়ে গেছে। যেমন—১৯১৯ সালে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতের উপর আফগান আক্রমণকে গান্ধিজী সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯২০ সালে বারদোলী প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯২১ সালে স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার 'তিলক স্বরাজ ফাণ্ড গঠনের কাজ সুরু হয়েছে।

এই পাঁচটি বছরে গান্ধিজী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে একটা সংগ্রামী সংগঠনে রূপদান করার চেষ্টা করেছেন। তিনি খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন যার উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের কংগ্রেসে টেনে আনা।

এই পাঁচ বছরে গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের জন্য কি করেছেন? কংগ্রেসীরা বলবেন তারা বারদোলী প্রোগ্রামকে কার্যকরী করার চেষ্টা করছেন। বারদোলী প্রোগ্রামের মধ্যে অস্পৃশ্যদের জন্য একটা প্রোগ্রাম ছিল। আমাদের জানা প্রয়োজন ঐ প্রোগ্রামটির কি হল? এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সে প্রোগ্রামে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কোন প্রস্তাব ছিল না। প্রোগ্রামটা ছিল অস্পৃশ্যদের কিছু দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করা। এই প্রস্তাবে অস্পৃশ্যতাকে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক কুঁয়া ও আলাদা স্কুল করার কথা হয়েছে। এমন সব ব্যক্তিদের নিয়ে এই সাবকমিটি তৈরী করা হয়েছিল যারা অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে আগ্রহশীল তো নয়ই; বরং বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। এই সাবকমিটির একমাত্র অস্পৃশ্যদরদী সদস্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। উক্ত সাবকমিটির জন্য নামমাত্র পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। একবার তো কোন সভা না করেই কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত অস্পৃশ্যদের উন্নয়নমূলক কাজকে হিন্দু মহাসভার উপর ছুড়ে দেওয়া হয়। বারদোলী প্রোগ্রামের যে অংশে অস্পৃশ্যদের বিষয়টা ছিল তৎপ্রতি গান্ধিজীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় নি। তিনি বরং স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে মদত দিয়েছেন, যাতে অস্পৃশ্যদের জন্য ব্যাপকভাবে কোন সংস্কার করা সম্ভব না হয়।

বারদোলী প্রোগ্রাম সম্পর্কে এই হল গান্ধিজীর ভূমিকা।

১৯২২ সালের পর গান্ধিজী কি করেছেন ? গান্ধিজীর জীবনী-মূলক পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় কি বলা হয়েছে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক ঃ—

“১৯২৪ সালে গান্ধিজী জেল থেকে মুক্তি পেলেন। কংগ্রেসের ২টি গ্রুপ যারা ‘আইন সভায় প্রবেশ’ না ‘গঠনমূলক কর্মসূচী’ এই নিয়ে বিবাদ করছিল তাদের মধ্যে তিনি একটা মিটমাটের চেষ্টা করলেন। ১৯৩০ সালে আবার আইনঅমান্য আন্দোলন সুরু হল। ১৯৩১ সালে গান্ধিজী লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করলেন। ১৯৩২ সালে পুনরায় জেলবন্দী হলেন। তারপর প্রধান মন্ত্রীর ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার’ বিরুদ্ধে আমরণ অনশন ঘোষণা করলেন। ১৯৩৩ সালে মন্দির প্রবেশ আন্দোলনের প্রোগ্রাম প্রস্তুত করেন এবং ‘হরিজন সেবক সংঘ’ গঠন করেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস থেকে তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করেন এবং অনশন করেন। তারপর জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯৪২ সালে ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনের পরিকল্পনা তৈরী করেন এবং কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৪ সালে লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে চিঠি-পত্র লেখালেখি সুরু করেন এবং ১৯৪২ সালের বিপ্লবী সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করেন। ১৯৪৫ সালে ‘কস্তুরবা ফাণ্ড’ খোলেন।”

১৯২৪ সালে গান্ধিজীর কাছে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের একটা ভাল সুযোগ এসেছিল। গান্ধিজী তখন কি করেছিলেন ?

১৯২২-৪৪ এই ২২ বছর কংগ্রেসের রাজনীতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল। ১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়। এই প্রোগ্রামে ৫টি বয়কট গৃহীত হয় ঃ (১) আইনসভা বয়কট, (২) বিদেশী বস্ত্র বয়কট প্রভৃতি। এই বয়কট আন্দোলনের প্রোগ্রামের বিরোধিতা করেন বিপিনবিহারী পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তৎসত্ত্বেও প্রোগ্রাম পাশ করান হয়। এই বছর ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবটি পুনরায় আলোচিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল এবার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন চিত্তরঞ্জন দাস এবং তাকে সমর্থন করেন লালা লাজপৎ

এই ভূমিকায় এই সময়কালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বাদ পড়ে গেছে। যেমন—১৯১৯ সালে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতের উপর আফগান আক্রমণকে গান্ধিজী সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯২০ সালে বারদোলী প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯২১ সালে স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার 'তিলক স্বরাজ ফাণ্ড গঠনের কাজ সুরু হয়েছে।

এই পাঁচটি বছরে গান্ধিজী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে একটা সংগ্রামী সংগঠনে রূপদান করার চেষ্টা করেছেন। তিনি খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন যার উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের কংগ্রেসে টেনে আনা।

এই পাঁচ বছরে গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের জন্য কি করেছেন? কংগ্রেসীরা বলবেন তারা বারদোলী প্রোগ্রামকে কার্যকরী করার চেষ্টা করছেন। বারদোলী প্রোগ্রামের মধ্যে অস্পৃশ্যদের জন্য একটা প্রোগ্রাম ছিল। আমাদের জানা প্রয়োজন ঐ প্রোগ্রামটির কি হল? এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সে প্রোগ্রামে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কোন প্রস্তাব ছিল না। প্রোগ্রামটা ছিল অস্পৃশ্যদের কিছু দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করা। এই প্রস্তাবে অস্পৃশ্যতাকে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক কুঁয়া ও আলাদা স্কুল করার কথা হয়েছে। এমন সব ব্যক্তিদের নিয়ে এই সাবকমিটি তৈরী করা হয়েছিল যারা অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে আগ্রহশীল তো নয়ই; বরং বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। এই সাবকমিটির একমাত্র অস্পৃশ্যদরদী সদস্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। উক্ত সাবকমিটির জন্য নামমাত্র পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। একবার তো কোন সভা না করেই কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত অস্পৃশ্যদের উন্নয়নমূলক কাজকে হিন্দু মহাসভার উপর ছুড়ে দেওয়া হয়। বারদোলী প্রোগ্রামের যে অংশে অস্পৃশ্যদের বিষয়টা ছিল তৎপ্রতি গান্ধিজীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় নি। তিনি বরং স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে মদত দিয়েছেন, যাতে অস্পৃশ্যদের জন্য ব্যাপকভাবে কোন সংস্কার করা সম্ভব না হয়।

বারদোলী প্রোগ্রাম সম্পর্কে এই হল গান্ধিজীর ভূমিকা।

১৯২২ সালের পর গান্ধিজী কি করেছেন ? গান্ধিজীর জীবনী-মূলক পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় কি বলা হয়েছে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক ঃ—

"১৯২৪ সালে গান্ধিজী জেল থেকে মুক্তি পেলেন। কংগ্রেসের ২টি গ্রুপ যারা 'আইন সভায় প্রবেশ' না 'গঠনমূলক কর্মসূচী' এই নিয়ে বিবাদ করছিল তাদের মধ্যে তিনি একটা মিটমাটের চেষ্টা করলেন। ১৯৩০ সালে আবার আইনঅমান্য আন্দোলন সুরু হল। ১৯৩১ সালে গান্ধিজী লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করলেন। ১৯৩২ সালে পুনরায় জেলবন্দী হলেন। তারপর প্রধান মন্ত্রীর 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার' বিরুদ্ধে আমরণ অনশন ঘোষণা করলেন। ১৯৩৩ সালে মন্দির প্রবেশ আন্দোলনের প্রোগ্রাম প্রস্তুত করেন এবং 'হরিজন সেবক সংঘ' গঠন করেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস থেকে তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করেন এবং অনশন করেন। তারপর জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের পরিকল্পনা তৈরী করেন এবং কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৪ সালে লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে চিঠি-পত্র লেখালেখি সুরু করেন এবং ১৯৪২ সালের বিপ্লবী সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করেন। ১৯৪৫ সালে 'কস্তুরবা ফাণ্ড' খোলেন।"

১৯২৪ সালে গান্ধিজীর কাছে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের একটা ভাল সুযোগ এসেছিল। গান্ধিজী তখন কি করেছিলেন ?

১৯২২-৪৪ এই ২২ বছর কংগ্রেসের রাজনীতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল। ১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়। এই প্রোগ্রামে ৫টি বয়কট গৃহীত হয় ঃ (১) আইনসভা বয়কট, (২) বিদেশী বস্ত্র বয়কট প্রভৃতি। এই বয়কট আন্দোলনের প্রোগ্রামের বিরোধিতা করেন বিপিনবিহারী পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তৎসত্ত্বেও প্রোগ্রাম পাশ করান হয়। এই বছর ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবটি পুনরায় আলোচিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল এবার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন চিত্তরঞ্জন দাস এবং তাকে সমর্থন করেন লালা লাজপৎ

রায়। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা দেখা দেয়। ১৯২২ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গান্ধিজীর ৬ বছরের কারাদণ্ড হয়। চিত্তরঞ্জন দাস আইনসভার বয়কট আন্দোলন পরিত্যাগ করে বিঠলভাই প্যাটেল, মতিলাল নেহেরু এবং মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে যোগ দেন। গান্ধিজীর সমর্থকরা এদের জোর বিরোধিতা করেন। তারা কলিকাতা ও নাগপুরের সিদ্ধান্তকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বদ্ধপরিকর। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে প্রবল ফাটল দেখা দিল। ১৯২৪ সালে অসুস্থতার জন্য গান্ধিজী জেল থেকে ছাড়া পেলেন। গান্ধিজী বাইরে এসে দেখতে পেলেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে দুটি যুধ্যমান গ্রুপ তৈরী হয়েছে। গান্ধিজী বুঝতে পারলেন যে, আত্মকলহে কংগ্রেস ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা সুরু করলেন। কোন পক্ষই গোঁ ছাড়তে রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত গান্ধিজী এমন প্রস্তাব পেশ করলেন যা উভয় পক্ষই মেনে নিল।

আইনসভা বয়কট বিরোধীদের খুশী করার জন্য গান্ধিজীর প্রস্তাব হল আইনসভায় প্রবেশ কংগ্রেসীদের আইনসঙ্গত অধিকার বলে গণ্য হবে। কোন কংগ্রেসী এর বিরোধিতা করতে পারবে না। বিরোধীদের খুশী করার জন্য গান্ধিজী বললেন অতঃপর বছরে কেবলমাত্র ৪ আনা চাঁদা দিয়ে কেউ কংগ্রেসের সদস্য হতে পারবে না। নিজহাতে কমপক্ষে ২,০০০ গজ সুতা চরকাতে কাটতে পারলে তবেই তাকে কংগ্রেসের সদস্য বলে গণ্য করা হবে। ৫টি বয়কট যারা পুরোপুরি মানবেন তারাই কংগ্রেস সংগঠনের পদাধিকারী হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন বলে গণ্য হবেন। যারা বয়কট নীতিকে প্রতিটি ক্ষেত্রে পালন করবেন না তারা অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

এখানে গান্ধিজী অস্পৃশ্যতাকে নির্মূল করার একটা মস্ত বড় সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাব করতে পারতেন, যদি কোন হিন্দু কংগ্রেসের সদস্য হতে চায় তবে তার নিজের জীবনে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে এবং প্রমাণস্বরূপ তার বাড়ীতে যে কোন কাজে একজন অস্পৃশ্যকে নিযুক্ত করতে হবে। অন্য কোন প্রমাণ অচল বলে গণ্য হবে। এরূপ প্রস্তাব মোটেই অবান্তর হত না ; কারণ তৎকালে প্রায়

প্রত্যেক বর্ণহিন্দুর বাড়ীতে কাজের জন্য একাধিক লোক রাখা হত। যেমন সুতা কাটা ও বয়কট আন্দোলন সমর্থন করা কংগ্রেসের সদস্য-পদ প্রার্থীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, তেমনি গান্ধিজী সদস্যপদ প্রার্থীদের পক্ষে বাড়ীর কাজে একজন করে অস্পৃশ্যকে নিযুক্ত করা বাধ্যতামূলক করতে পারতেন। কিন্তু গান্ধিজী তা করার কথা ভাবেন নি।

১৯২৪ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত ৬টি বছর গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের জন্য বা অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য কিছুই করেন নি। গান্ধিজী নিষ্ক্রিয় থাকলেও অস্পৃশ্যরা কিন্তু এই সময় নিষ্ক্রিয় থাকে নি। তারাও সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করে। এই সত্যাগ্রহ ছিল সাধারণ জলাশয় থেকে অস্পৃশ্যদের জল নেওয়া এবং অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য। বোম্বাই প্রদেশের কোলাবা জিলার মাহাদের চৌদার পুকুরের জলে অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যাগ্রহ হল। নাসিকের কলারাম মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার লাভের জন্য সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হল। তাছাড়াও আরো অনেক সত্যাগ্রহ চলতে থাকে। বর্ণহিন্দুরা তাতে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হয়। অস্পৃশ্যদের মধ্যে উৎসাহের বন্যা দেখা যায়। ভারতের চতুর্দ্দিকে দারুন সোরগোল ওঠে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা অস্পৃশ্যরা আক্রান্ত হতে থাকে। অনেকে সংঘর্ষে আহত হয়। শান্তিভঙ্গের অপরাধে অনেকে কারারুদ্ধ হতে থাকে। এই আন্দোলন চলতে থাকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৩৫ সালে ইয়োলাতে একটি বিরাট ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং যেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যেহেতু উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের হিন্দু বলে স্বীকার করে না, সেহেতু তারা ধর্মান্তর গ্রহণ করবে।

এই সব সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক ছিল না। এগুলি অস্পৃশ্যদের দ্বারা, অস্পৃশ্যদের নেতৃত্বে এবং অস্পৃশ্যদের অর্থে পরিচালিত হয়। অস্পৃশ্যরা আশা করেছিল যে, গান্ধিজী তাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সমর্থন করবেন। কারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সৃষ্টিকর্ত্তা গান্ধিজী স্বয়ং। তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অধিকার আদায়ের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করেছিলেন। আর অস্পৃশ্যরা বর্ণহিন্দুদের কাছ থেকে তাদের

সামাজিক অধিকার আদায়ের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে ব্যবহার করছে। সুতরাং তারা গান্ধিজীর কাছ থেকে সমর্থন আশা করতেই পারে। অথচ দেখা গেল গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করছেন। এটাই হল গান্ধিজীর দ্বৈত চরিত্র।

এই প্রসঙ্গে মানবিক অধিকার আদায়ের জন্য গান্ধিজীর সৃষ্ট দুটি অদ্ভুত অস্ত্রের কথা উল্লেখ করতেই হবে। তিনি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য সত্যাগ্রহ অস্ত্রটিকে বহুবার প্রয়োগ করেছেন। হিন্দু বলে কথিত অস্পৃশ্যদের সাধারণ জলাশয়ে বা দেবমন্দিরে প্রবেশের স্বাভাবিক অধিকার লাভের জন্য গোঁড়া বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে তিনি একবারও কি সত্যাগ্রহের প্রয়োগ করেছেন ? গান্ধিজীর দ্বিতীয় অস্ত্রটির নাম অনশন। এটা বলা হয় যে. গান্ধিজী তাঁর জীবনে ২১ বার অনশন করেছেন। রাজনৈতিক কারণে, হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কারণে, সরকারের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে, তার আশ্রমের নানা ব্যাপারে তিনি ২১ বার অনশন করেছেন ; কিন্তু একবারও কি তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য অনশন করেছেন ? এটা কি একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নয় ?

১৯৩০ সালে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক সুরু হয়। গান্ধিজী ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। এই বৈঠকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভারতের স্বায়ত্বশাসনের জন্য সংবিধান প্রণয়ন। ভারত সরকারকে হতে হবে জনগণের সরকার। ভারতের জনসাধারণ অসংখ্য সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু নানা ভাগে বিভক্ত। তাই ভারত সরকারকে সঠিকভাবে জনগণের দ্বারা গঠিত হতে হলে তার আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগকে সম্প্রদায়-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

অস্পৃশ্যদের সমস্যাটি গোলটেবিল বৈঠকে গুরুতর হয়ে দেখা দিল। এটা সমস্যার একটা নূতন দিক। অস্পৃশ্যরা কি বর্ণহিন্দুদের দয়ার উপর নির্ভর করে থাকবে ? না তাদের ন্যায্য প্রাপ্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করা হবে ? তারা দাবী করল যে, তারা আর বর্ণহিন্দুদের মর্জির উপর নির্ভর করেবে না। অন্যান্য সংখ্যালঘুদের যেমন নিরাপত্তা সুরক্ষিত আছে তেমনি

অস্পৃশ্যদেরও থাকবে। অস্পৃশ্যদের এই দাবী সকলে মেনে নিলেন। কারণ এটা ছিল ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত। হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমান, খৃষ্টান, শিখদের যেমন সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তেমনি বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে অস্পৃশ্যদের পার্থক্য আরো বেশী সুস্পষ্ট। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ধর্মীয়; কিন্তু বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে অস্পৃশ্যদের পার্থক্য যেমন ধর্মীয়, তেমনি সামাজিক। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে পার্থক্য তাতে মুসলমানদের উপর রাজনৈতিক বিপদ আসতে পারে না; কারণ তাদের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। অথচ বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে যে পার্থক্য তাতে অস্পৃশ্যদের উপর রাজনৈতিক দুর্যোগ নেমে আসতে পারে; কারণ উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক হল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। অস্পৃশ্যরা চেষ্টা করছে পার্থক্যটাকে কমাতে; কিন্তু বর্ণহিন্দুরা যুগ যুগ ধরে সামাজিক বিধিনিষেধের মাধ্যমে পার্থক্যটাকে চিরস্থায়ী করে রেখেছে। এই পার্থক্য দূর করার জন্য অস্পৃশ্যদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেছে। তাই আজ যখন ক্ষমতা সংখ্যাগুরুদের হাতে হস্তান্তর হতে যাচ্ছে তখন মুসলমান বা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মত অস্পৃশ্যদেরও রাজনৈতিক নিরাপত্তা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

এখানেও গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারের হাত থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য তাদের দাবীকে সমর্থন করতে পারতেন; কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশ তো দূরের কথা, গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের দাবী নস্যাৎ করে দেবার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন। তিনি মুসলমানদের সঙ্গে প্যাক্ট করলেন যাতে অস্পৃশ্যদের বিচ্ছিন্ন করা যায়। মুসলমানদের নিকট থেকে তেমন সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আমরণ অনশন সুরু করলেন যাতে বৃটিশ সরকার মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের যে রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছিল তার থেকে অস্পৃশ্যদের বঞ্চিত করা হয়। বৃটিশ সরকারের সঙ্গে না পেরে শেষ পর্যন্ত পুনাচুক্তির কৌশল অবলম্বন করে গান্ধিজী অস্পৃশ্যদেরকে তাদের ন্যায্য রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে সক্ষম হলেন।

১৯৩৩ সালে গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশের জন্য

আন্দোলন করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি নিজে গুরুভায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের দায়িত্ব নেন এবং বলেন যে, এজন্য তিনি প্রয়োজনে অনশন পর্যন্ত করবেন। কিন্তু নানা অজুহাত দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। রঙ্গ আয়ার উত্থাপিত অস্পৃশ্যদের 'মন্দির প্রবেশ বিল' কেন্দ্রীয় আইনসভায় পাশ করানোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গান্ধিজী প্রতিশ্রুতি দেন। শেষ পর্যন্ত যখন কংগ্রেসীরা হিন্দু ভোটের স্বার্থে রঙ্গ আয়ারের বিলের পক্ষ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় তখন গান্ধিজী রঙ্গ আয়ারের পরিবর্তে কংগ্রেসীদেরই পক্ষ অবলম্বন করেন।

১৯৩৩ সালে গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের জন্য আরো একটি আন্দোলনের কথা বললেন। এজন্য তিনি গঠন করলেন 'হরিজন সেবক সংঘ'। এই সংঘের শাখা প্রশাখা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার কথা ঘোষণা করা হল। এর পশ্চাতে তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়। প্রথমতঃ বলা হল যে, অধিকাংশ বর্ণহিন্দুদের মনে অস্পৃশ্যদের প্রতি একটা শুভেচ্ছা রয়েছে যার ফলে তারা অস্পৃশ্যদের কল্যাণের জন্য উদার হস্তে অর্থ সাহায্য করবে। দ্বিতীয়তঃ অস্পৃশ্যরা দৈনন্দিন জীবনে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা দূর করার জন্য বর্ণহিন্দুদের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা পাওয়া যাবে। তৃতীয়তঃ এসবের মাধ্যমে বর্ণহিন্দুদের প্রতি অস্পৃশ্যদের বিশ্বাস সৃষ্টি হবে।

দুঃখের বিষয় এই তিনটি উদ্দেশ্যের একটিও বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। প্রথম ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুরা সংঘকে মাত্র ৮ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছে যেখানে যেখানে রাজনৈতিক কারণে তারা কোটি কোটি টাকা দিয়েছে। এখন সংঘ চলছে সরকারী অনুদান, গান্ধিজীর নিজের লেখা বই বিক্রী করা অর্থে ও গান্ধিজীরকৃপাধন্য হওয়ার জন্য ধনবান ব্যক্তিদের বদান্যতায়। সংঘের শাখা ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সংঘ যেভাবে গুটিয়ে আসছে তাতে মনে হয় অনতিবিলম্বে সংঘের কেন্দ্র ছাড়া আর কোন শাখার অস্তিত্ব থাকবে না।

কেবল এটাই দুঃখজনক নয় যে, এই সংঘ সম্পর্কে বর্ণহিন্দুরা তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। যে অস্পৃশ্যদের জন্য এই সংঘ স্থাপন করা হয়েছিল তারাও এতে কোন উৎসাহ লাভ করতে পারে

নি। এর মধ্যে আরো অনেক কারণ আছে। অস্পৃশ্যদের প্রাথমিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে সংঘ তার নিজের মত করে অস্পৃশ্যদের সাহায্য দানের কথা চিন্তা করেছে। সংঘের পরিচালনায় কোন অস্পৃশ্য সদস্য গ্রহণ করা হয় নি। ফলে তারা এটাকে একটা বিদেশী সংস্থা বলে এবং ভিক্ষুকের মত সংঘের কাছে সাহায্যপ্রার্থী বলে নিজেদের মনে করেছে। গান্ধিজী সংঘকে এই ভাবেই তৈরী করেছিলেন এবং তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিয়েছিলেন। মনে হচ্ছে গান্ধিজীর জীবদ্দশাতেই সংঘের আয়ু শেষ হয়ে যাবে।

এই সব চিত্র যদি গান্ধিজীর অস্পৃশ্যতা-বিরোধী চরিত্রটিকে জনসমক্ষে উদ্ঘাটন করে থাকে তাতে পাঠকদের আশ্চর্য হওয়ায় কিছুই নেই। এখন পাঠকবর্গ হয়ত তাদের ধারণাটিকে স্পষ্টতর করার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন তুলতে পারেন ঃ—

(১) ১৯২১ সালে গান্ধিজী 'তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের' জন্য ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন। তিনি একথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে, অস্পৃশ্যতা দূর না হওয়া পর্যন্ত স্বরাজলাভের কোন সম্ভাবনা নেই। তাহলে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে কেন মাত্র ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়িত হল ?

(২) ১৯২২ সালে 'বারদোলী প্রোগ্রাম' গ্রহণ করা হল। বারদোলী প্রোগ্রামের মধ্যে অস্পৃশ্যদের উন্নয়ন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে চিহ্নিত হল। সে কাজের প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য কেন মাত্র ৫ শত টাকা মঞ্জুর করা হল ? কেন এই সাব-কমিটির কাজ বন্ধ হয়ে গেল ? এই সাব-কমিটির কাজ ভালভাবে সুরু করার জন্য অর্থের প্রয়োজনে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে জোর দাবী জানিয়েছেন তখন গান্ধিজী কেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে সমর্থন জানান নি ? এই কমিটি যখন ভেঙ্গে দেওয়া হল তখন গান্ধিজী কেন তার প্রতিবাদ করেন নি ? পরে গান্ধিজী কেন পুনরায় নূতন কমিটি করলেন না ? অস্পৃশ্য সমাজের উন্নয়নের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়াটা গান্ধিজী কিভাবে মেনে নিলেন ?

(৩) স্বরাজ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে তা সুরু করার আগে গান্ধিজী ৫টি শর্ত আরোপ করেছিলেন ঃ (ক) হিন্দু-

মুসলমান ঐক্য ; (খ) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ; (গ) চরকায় সুতা কাটা ও খাদির ব্যবহার ; (ঘ) অহিংস আন্দোলন ; এবং (ঙ) সম্পূর্ণ অসহযোগ। গান্ধিজী কেবলমাত্র এই শর্তগুলি আরোপই করেন নি, তিনি বলেছেন এই ৫টি শর্ত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্বরাজলাভ কোন মতেই সম্ভব নয়। ১৯২২ সালে তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য অনশন করেছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি বললেন যে, চরকায় সুতা না কাটলে তাকে কংগ্রেসের সদস্যপদ দেওয়া হবে না। অথচ অস্পৃশ্যতা পালন না করাকে কেন তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণের শর্ত হিসাবে ঘোষণা করলেন না ?

(৪) গান্ধিজী অনেক কারণে অনেকবার অনশন করেছেন। কেন তিনি একবারও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য অনশন করলেন না ?

(৫) অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের প্রয়োগ গান্ধিজীর একটি অমোঘ অস্ত্র। এই অস্ত্রটি তিনি অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন ; কিন্তু তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে একবারও ওই অস্ত্রটির প্রয়োগ করলেন না কেন ?

(৬) গান্ধিজীর নীতি অনুসরণ করে অস্পৃশ্যরা ১৯২৭ সাল থেকে সাধারণ জলাশয়ে ও মন্দিরে প্রবেশের জন্য বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সুরু করেন। গান্ধিজী কেন অস্পৃশ্যদের সত্যাগ্রহের নিন্দা করেছেন ?

(৭) গান্ধিজী বলেছিলেন যে, গুরুভায়ুর মন্দির অস্পৃশ্যদের জন্য উন্মুক্ত করা না হলে তিনি অনশন শুরু করবেন। মন্দির দ্বার উন্মুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন অনশন করলেন না ?

(৮) কংগ্রেসের সমর্থনে রঙ্গ আয়ারের 'মন্দির-প্রবেশ বিল' কেন্দ্রীয় আইনসভায় উত্থাপনের অনুমতি না দিলে গুরুতর পরিণাম হবে বলে গান্ধিজী ১৯৩২ সালে গভর্ণর জেনারেলকে হুমকি দেন। পরে নির্বাচনের স্বার্থে কংগ্রেস বিলের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে গান্ধিজী কেন কংগ্রেসকে সমর্থন করলেন ? তাহলে অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশের চেয়ে কংগ্রেসের ভোটে জয়লাভ করাটাই কি গান্ধিজীর কাছে অধিকতর বাঞ্ছনীয় নয় ?

(৯) গান্ধিজী জানেন যে, নাগরিক অধিকার লাভ অস্পৃশ্যদের

কাছে কঠিন নয় ; কিন্তু কঠিন হল সেই অধিকারসমূহ ভোগ করা। কারণ উক্ত অধিকারসমূহ ভোগ করতে গেলেই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের উপর অত্যাচার সুরু করে। এমন কি তাদের উপর অর্থনৈতিক বয়কট চাপিয়ে দেয়। গান্ধিজীর 'হরিজন সেবক সংঘ' এর প্রতিকারের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি কেন ?

(১০) গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের জন্য আন্দোলন সুরু করার আগে 'ডিপ্রেস্‌ড ক্লাসেস মিশন' নামে একটি সংস্থা অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য কাজ করছিল। যদিও তার জন্য অর্থ উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দিত, তথাপি উক্ত সংস্থার পরিচালনায় অস্পৃশ্যদের গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু গান্ধিজীর প্রতিষ্ঠিত 'হরিজন সেবক সংঘের' পরিচালক সমিতিতে কেন অস্পৃশ্যদের গ্রহণ করা হল না ?

(১১) গান্ধিজী যদি অস্পৃশ্যদের যথার্থ বন্ধু হতেন তাহলে তিনি কেন তাদের রাজনৈতিক রক্ষাকবচের বিরোধিতা করেছিলেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে প্যাক্ট করে অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক রক্ষাকবচকে বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ? কেন তিনি অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক রক্ষাকবচমূলক 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার' বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন ?

(১২) পুনা চুক্তির পরে গান্ধিজী কেন তার প্রতিশ্রুতি পালন না করে অস্পৃশ্যদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন ? কংগ্রেসীরা কেন অস্পৃশ্যদের মধ্য থেকে এজেন্ট নিযুক্ত করে তাদের মাধ্যমে অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার লুণ্ঠন করছে ?

(১৩) পুনা চুক্তির পর গান্ধিজী কেন ভদ্রলোকের চুক্তি মেনে নিয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় অস্পৃশ্য সদস্য গ্রহণ করার জন্য কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডকে নির্দেশ দেন নি ?

৩

এই সমস্ত প্রশ্নের কী উত্তর গান্ধিজী দেবেন ? গান্ধিজীর বন্ধুরাই বা এই সব প্রশ্ন সম্পর্কে কী ব্যাখ্যা দেবেন ? গান্ধিজীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন এত ক্ষণভঙ্গুর ও স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ ছিল যে তা সত্যই খুব রহস্যজনক বলে মনে হয়। এর কার্যকারিতা

সম্পর্কে অনেকের সন্দেহ আছে। অনেকেই মনে করেন যে, এই আন্দোলনের পিছনে গান্ধিজীর কোন আন্তরিকতা বা সততা নেই। গান্ধিজীর নেতৃত্বের সুনাম ও সততার খাতিরে উপরে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা গান্ধিজী ও তার বন্ধুদের একান্তভাবে দেওয়া প্রয়োজন।

গান্ধিজী এবং তার বন্ধুদের সম্পর্কে অনেকেই যে উৎসুক হবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। তাদের উত্তর কি হবে তা নিয়ে আগাম জল্পনা-কল্পনা করা ঠিক হবে না। বরং গান্ধিজী ও তার বন্ধুদের উত্তর প্রস্তুত করার জন্য সময় দেওয়া উচিত। তারা তা ধীরে-সুস্থে করুন। আমরা ইতিমধ্যে প্রশ্ন তুলতে পারি যে, অস্পৃশ্যরা গান্ধিজী ও তার অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করছে ?

অস্পৃশ্যরা কি মনে করে যে, গান্ধিজী তাদের সম্পর্কে অকপট ছিলেন ? এর উত্তরটা নিশ্চয়ই না বাচক। তারা গান্ধিজীকে অকপট বলে মনে করতে পারেন না। কি করে করবেন ? ১৯২১ সালে যখন সারা দেশ বারদোলী প্রোগ্রাম কার্যকরী করার জন্য উৎসুক হয়ে আছে তখন গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের উন্নয়নমূলক দফা সম্পর্কে কিভাবে অমন নিস্পৃহ হয়ে থাকলেন ? তিলক ফাণ্ডে সংগৃহীত ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মধ্যে অস্পৃশ্যদের জন্য মাত্র ৪৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি একটি কথাও বলেন নি তাকে অস্পৃশ্যরা কি করে অকপট বলে মনে করতে পারে ?

১৯২৪ সালে অস্পৃশ্যতা দূর করার একটা সুযোগ যার হাতে এসেছিল এবং তা যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করলেন না তাকে অস্পৃশ্যরা কি করে অকপট বলে বিশ্বাস করতে পারে ? উক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে তিনটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হত।

প্রথমতঃ কংগ্রেসের জাতীয়তাবোধের গভীরতা প্রমাণিত হত। দ্বিতীয়তঃ অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হত ; তৃতীয়তঃ হিন্দুধর্মের কলঙ্কজনক অস্পৃশ্যতা ব্যাধি দূরীকরণার্থে গান্ধিজীর সততা প্রমাণিত হত। তবু গান্ধিজী তা করলেন না ? এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, গান্ধিজী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেয়ে চরকায় সুতা কাটা

অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন ? অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাজটা ছিল তার মনের প্রোগ্রামের একেবারে শেষের ধাপে এবং সম্ভবতঃ কোন ধাপেই নয়।

গান্ধিজী যে ঘোষণা করেছিলেন অস্পৃশ্যতা দূরীভূত না হলে স্বরাজ আসতে পারে না ; এটা কি তার মনের কথা, না একটা কথার কথা ? যে ব্যক্তি ঘোষণা করেছিলেন যে, গুরুভায়ুর মন্দির-দ্বার অস্পৃশ্যদের জন্য উন্মুক্ত না হলে তিনি অনশন করবেন, সেইমন্দিরের দ্বার আজও মুক্ত না হওয়া সত্বেও যিনি অনশন করলেন না তাকে কি অস্পৃশ্যরা অকপট বলে মনে করতে পারে ? যে ব্যক্তি নিজেকে মন্দির প্রবেশ বিলের প্রকৃত প্রবর্তক বলে ঘোষণা করে পরে সেই বিলের প্রত্যাহারকে সমর্থন করেন, তাকে কি অস্পৃশ্যরা অকপট বলে বিশ্বাস করতে পারে ? যে ব্যক্তি কথায় কথায় অনশন করেন ; অথচ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে একবারও অনশন করলেন না, তাকে কী করে অস্পৃশ্যরা অকপট বলে গ্রহণ করতে পারে ?

যে ব্যক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহকে জীবনের ব্রত হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, সেই ব্যক্তি যদি হিন্দু সমাজের সবচেয়ে বড় ব্যাধি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে একবারও সত্যাগ্রহ না করে থাকেন, তবে তাকে অস্পৃশ্যরা কি করে অকপট বলে মনে করতে পারে ? যে ব্যক্তি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কোন কাজ না করে কেবল নীতিবাক্য আউড়েছেন, তাকে অস্পৃশ্যরা কী করে অকপট বলে বিশ্বাস করবে ?

অস্পৃশ্যরা কি গান্ধিজীকে সৎ এবং সরল বলে মনে করতে পারে ? এর উত্তর হল, পারে না। স্বরাজ আন্দোলনের সুরুতে গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের বৃটিশকে সমর্থন করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে, তারা যেন কখনো খ্রীষ্টধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ না করে। তিনি তাদের বলেছিলেন, হিন্দুধর্মের মধ্যেই তারা মুক্তির সন্ধান পাবে। তিনি হিন্দুদের বলেছিলেন—'স্বরাজ পেতে হলে তোমাদের অস্পৃশ্যতা দূর করতে হবে'। তথাপি ১৯২১ সালে তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের একটি ভগ্নাংশ মাত্র অস্পৃশ্যদের জন্য বরাদ্দ করা হল এবং যখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অস্পৃশ্যদের উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল, তখন গান্ধিজী তার প্রতিবাদে একটি

কথাও বলেন নি।

তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা গান্ধিজীর হাতে দেওয়া হয়েছিল। কেন তার একটা পর্যাপ্ত অংশ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য নির্দ্ধারণ করলেন না? গান্ধিজী যে অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে একেবারে নিস্পৃহ ছিলেন এটা নিঃসন্দেহ। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হল গান্ধিজীর উদাসীনতা সম্পর্কে তার জবাব হল, স্বরাজলাভ সম্পর্কে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেবার মত সময় তিনি দিতে পারেন নি। এরূপ জবাব দিতে তিনি কোন লজ্জা অনুভব করেন নি; বরং তিনি তার উদাসীনতা সম্পর্কে একটা নীতিগত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছেন। তার বক্তব্য, এই সময় তিনি রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে খুবই নিমগ্ন ছিলেন; কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতবাসীর সামগ্রিক মুক্তি এলে অস্পৃশ্যদের মুক্তি স্বাভাবিকভাবেই এসে যাবে। তাছাড়া যে হিন্দুরা বৃটিশের দাস তারা কি করে অস্পৃশ্যদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে?

এবার লক্ষ্য করুন গান্ধিজীর বক্তব্যটি। অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে তার মন্তব্য হল 'দাসস্য দাস'। তিনি আরো বলেছেন 'বৃহত্তর স্বার্থের মধ্যে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ' নিহিত আছে। কথা দুটি শুনতে ভাল লাগে। তাহলে গান্ধিজীর ব্যাখ্যা অনুসারে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির অর্থ কি দেশের প্রতিটি মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি? আমরা গান্ধিজীর বাগচাতুর্য নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না। আমরা আলোচনা করছি গান্ধিজীর সততা ও সরলতা নিয়ে। আমরা কি কোন মানুষের সততার স্বীকৃতি দেব তার অজুহাত দেওয়ার নিপুণতা বিচার করে? অস্পৃশ্যরা কি বিশ্বাস করতে পারে যে, গান্ধিজী তাদের স্বার্থের একনিষ্ঠ সমর্থক?

যদি অস্পৃশ্যরা মুসলমান ও শিখদের রাজনৈতিক রক্ষাকবচের সঙ্গে তাদের রক্ষাকবচের প্রতি গান্ধিজীর মনোভাবের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে, তবে তারা কি গান্ধিজীকে একজন সৎ ও সরল প্রকৃতির লোক বলে মনে করবে?

গান্ধিজী তফসিলীদের সঙ্গে অন্যান্য সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক

রক্ষাকবচ সম্পর্কে একটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করেছেন। তিনি বলেন, মুসলমান ও শিখদের একটা পৃথক ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো সেই ঐতিহাসিক কারণটা বিশ্লেষণ করেন নি। এটা অনুমান করা যায় যে, এই ঐতিহাসিক কারণটা হল মুসলমান ও শিখরা হল ভারতের শাসকশ্রেণীরই একটা অংশ। তিনি অবশ্য একথা জোরের সঙ্গেই বলেন যে, তিনি সমস্ত সংখ্যালঘুদের একই দৃষ্টিতে দেখেন। তাই যদি হয় তবে গান্ধিজী কি ভাবে তফসিলী শ্রেণীর দাবীর বিরোধিতা করতে পারেন ? ঐতিহাসিক কারণে যদি তিনি মুসলমান ও শিখদের পৃথক সত্তা স্বীকার করতে পারেন, তবে নৈতিক কারণে কেন তিনি অস্পৃশ্যদের পৃথক সত্তা মেনে নেবেন না ? ঐতিহাসিক কারণটা গান্ধিজীর কাছে একটা অজুহাত মাত্র। আসলে তিনি অস্পৃশ্যদের দাবীকে একটা অজুহাত দেখিয়ে নস্যাৎ করতে চান।

গান্ধিজীর সম্মুখে যখনই সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের সমস্যা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন এসেছে তখন তিনি দারুন বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি এই সমস্যাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থার চাপে পড়ে গান্ধিজীকে অনেকবার এই অপ্রীতিকর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৩৯ সালের ২১ অক্টোবর 'হরিজন' পত্রিকায় 'সংখ্যা-গুরুর রূপকথা' নাম দিয়ে তিনি একটি সম্পাদকীয় লেখেন। যারা এদেশে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এই সম্পাদ-কীয়তে তিনি তাদের বিরুদ্ধে দারুণভাবে বিষোদ্‌গার করেছেন। এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি মুসলমানদের সংখ্যালঘু নামে অভিহিত করতে অস্বীকার করেছেন। এমন কি খৃষ্টান ও শিখদেরও সংখ্যালঘু বলতে তিনি আপত্তি জানিয়েছেন। তার বক্তব্য হল, সংখ্যালঘু বলতে সাধারণতঃ তাদের বোঝায় যারা সমাজের নির্যাতিত। সেদিক থেকে এদের কোনপ্রকারেই সংখ্যালঘু বলা চলে না। তবে সংখ্যাগত হিসাবে হয়ত এদের সংখ্যালঘু বলা যেতে পারে—তার অর্থ তারা প্রকৃত সংখ্যালঘু নয়।

এবার দেখা যাক গান্ধিজী তফসিলী জাতিসমূহ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতেন ? তিনি কি তফসিলীদের সংখ্যালঘু হিসাবে

স্বীকার করতে চাইতেন না ? এ সম্পর্কে গান্ধিজীর নিজের ভাষায় উত্তর খোঁজা যাক। তিনি বলেন ঃ—

"আমি এতক্ষণ দেখাতে চেষ্টা করেছি যে ভারতে যথার্থ সংখ্যালঘু বলতে এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের স্বার্থ দেশ স্বাধীন হলে ব্যাহত হবে। একমাত্র নির্যাতিত শ্রেণী ছাড়া আর কোন সম্প্রদায় নেই যারা তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম নয়।"

এখানে গান্ধিজী স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে, ভারতে তফসিলী শ্রেণীই একমাত্র সংখ্যালঘু যারা স্বাধীন ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনে নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে অক্ষম। একথা স্বীকার করা সত্ত্বেও গান্ধিজী কিন্তু অস্পৃশ্যদের জন্য কোনপ্রকার রাজনৈতিক রক্ষাকবচ অনুমোদনের ঘোর বিরোধিতা করেছেন। তাহলে কোন যুক্তিতে অস্পৃশ্যরা গান্ধিজীকে সৎ ও অকপট বলে মনে করতে পারে ?

গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকে অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক রক্ষাকবচের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যদের অধিকার নস্যাৎ করার সব রকম চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যদের দাবীকে পিছন থেকে ছুরি মারার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে তাদের ১৪ দফা দাবী পর্যন্ত মেনে নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। অথচ এই গান্ধিজী সংখ্যালঘু সাব-কমিটির সভায় বলেছিলেন—"যদি সাব-কমিটি অস্পৃশ্যদের দাবী মেনে নেয়, তবে আমি তা অস্বীকার করার কে ?" একথা বলার পরেও গান্ধিজী মুসলমান নেতাদের কাছে জিন্না সাহেবের ১৪ দফা দাবীকে মেনে নেবার গোপন প্রস্তাব এই শর্তে রাখলেন যে, মুসলমানরা তফসিলীদের দাবীর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করবে। দ্বিতীয়টি স্বীকার করলে তারা প্রথমটি পাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধিজীর চক্রান্ত ব্যর্থ হল। মুসলমানরা তাদের ১৪ দফা দাবী পেলেন এবং অস্পৃশ্যরাও তাদের দাবীর স্বীকৃতি পেল। গান্ধিজীর চক্রান্ত 'একটা ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতার দলিল' হয়ে রইল। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে বন্ধু বলে ঘোষণা করেও সুযোগ বুঝে তাকে পিছন থেকে ছুরি মারে এবং নিজের প্রতিশ্রুতিকে খোলামকুচির মত ছুড়ে ফেলে দেয়, তবে লোকে তাকে কোন অভিধায় ভূষিত করবে ? তাকে কি অস্পৃশ্যরা সৎ ও অকপট বলে মনে করতে পারে ?

শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার ভার গান্ধিজী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপর ছেড়ে দেন। গান্ধিজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক দাবী মেনে নেন। যেহেতু বিষয়টির ভার লিখিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, সেহেতু গান্ধিজী উক্ত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আইনতঃ ও নীতিগতভাবে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু গান্ধিজী উক্ত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকৃত হন ও তার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন ঘোষণা করেন। এই অনশনের দ্বারা গান্ধিজী সারাভারত ও সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই অনশনের কারণটি ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানে অস্পৃশ্যদের জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বীকৃত সাংবিধানিক রাজনৈতিক সংরক্ষণ। গান্ধিজীর শিষ্যরা এই অনশনকে 'ঐতিহাসিক অনশন' বলে ঘোষণা করেন। কেন এটাকে ঐতিহাসিক অনশন বলা হল তার কারণ অনুধাবন করা বেশ কঠিন। হিন্দু ঐক্যের নামে তফসিলীদের বঞ্চনা ছাড়া এর মধ্যে মহত্ব বলে কিছু ছিল না। গান্ধিজীর পক্ষে এই অনশন ছিল নীতিবিরুদ্ধ।

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটা রাজনৈতিক কৌশল। এর উদ্দেশ্যে ছিল বৃটিশ সরকারকে তার দাবীর প্রতি নতি স্বীকার করানো। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, বৃটিশ সরকারের কাছে তার কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল তখন গান্ধিজী নূতন কৌশল অবলম্বন করে আমার কাছে প্রস্তাব পাঠালেন—'আমার জীবন আপনার হাতে ; আপনি কি আমার জীবন রক্ষা করবেন ?' গান্ধিজী কেন 'পুনা-প্যাক্টের' জন্য এত অধীর হয়ে উঠলেন ? তার একমাত্র কারণ হল আমরণ অনশনের মুখ রক্ষা করে কোন প্রকারে নিজের জীবনটা বাঁচানো। আসলে অনশনের নামে তিনি যে ভারতবাসী ও বিশ্বাসীকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিলেন, এটা কি তার প্রমাণ নয় ?

গান্ধিজীর এই অনশনের মধ্যে মহত্ব কিছু ছিল না। এটা একটা জঘন্য রাজনৈতিক চাল। এর মধ্যে অস্পৃশ্যদের স্বার্থরক্ষার বিন্দুমাত্র প্রয়াস ছিল না। এটা ছিল অস্পৃশ্যদের স্বার্থবিরোধী, বিশেষ করে অস্পৃশ্যদের সাংবিধানিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর রায়ের বিরুদ্ধে অসহায় জনগণকে পীড়নমূলক গান্ধিজীর হীন

কৌশল। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা নীতিহীন জঘন্য অপকৌশল। তাহলে অস্পৃশ্যরা কি করে গান্ধিজীকে একজন সৎ ও অকপট ব্যক্তি বলে মনে করতে পারে ?

পুনাচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর গান্ধিজীর ভক্তরা প্রচার করতে থাকেন যে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাজনৈতিক নিরাপত্তার বিধান অস্পৃশ্যদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই জন্য তিনি মুসলমান-দের সঙ্গে এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং আমরণ অনশন ঘোষণা করেছিলেন। সূক্ষ্ম বিচার করলে দেখা যাবে যে, 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' ও 'পুনা-প্যাক্টের' মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। পুনা-প্যাক্টেও অস্পৃশ্যদের পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যদি তিনি সৎ ও অকপট হতেন তবে পুনাচুক্তির কৌশলকে অবলম্বন করে তিনি কি এভাবে আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল হতে পারতেন ?

অস্পৃশ্যরা কি গান্ধিজীকে তাদের বন্ধু বা সহযোগী হিসাবে গণ্য করতে পারে ? কখনো নয়। কি করে পারবে ? হতে পারে গান্ধিজী বিশ্বাস করতেন যে, অস্পৃশ্যদের সমস্যা সামাজিক সমস্যা। যিনি মনে করেন জাতব্যবস্থা ভাল, অস্পৃশ্যতা খারাপ ; সেই গান্ধিজীকে তারা কি করে তাদের বন্ধু বলে স্বীকার করতে পারে ? অস্পৃশ্যতা হল জাতব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। জাতব্যবস্থার বিলোপ না করে কি অস্পৃশ্যতা দূর করা কখনো সম্ভব ?

হতে পারে গান্ধিজী বিশ্বাস করেন যে, অস্পৃশ্যদের সমস্যা সামাজিকভাবে সমাধান করা যেতে পারে। এটা যে কেউ চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে, সামাজিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক-ভাবে পুরোপুরি করা না গেলেও সমস্যার সমাধানে তা যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক। অথচ গান্ধিজী ছিলেন অস্পৃশ্যদের কোনপ্রকার রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের বিরোধী। তাহলে কি করে অস্পৃশ্যরা গান্ধিজীকে তাদের বন্ধু হিসাবে গণ্য করতে পারে ?

গান্ধিজী যদি অস্পৃশ্যদের বন্ধু হতেন তবে তিনি তাদের রাজ-নৈতিক নিরাপত্তার জন্য নিজেই সংগ্রামে নামতে পারতেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে না নামলেও তিনি তাদের সংগ্রামকে পরোক্ষভাবে সহায়তা

করতে পারতেন। তিনি যদি তাদের বন্ধু হতেন তবে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় তাদের আইনসভার সদস্য, মন্ত্রীসভার সদস্য, প্রশাসনের উচ্চপদে অধিকারী দেখে তিনি নিশ্চয় খুশী হতেন। বন্ধু হলে তিনি অস্পৃশ্যদিগকে এসব অধিকার লাভে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে পারতেন ; কিম্বা অন্তত পক্ষে কোনপ্রকার বাধা সৃষ্টি না করে নিরপেক্ষও থাকতে পারতেন। কিন্তু আমরা কি দেখলাম ? দেখলাম যে তিনি এসবের প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় নেমেছেন। কারো স্বার্থবিরোধী কাজ করে কেউ কি কখনো কারো বন্ধু বলে গণ্য হতে পারে ? তাই অস্পৃশ্যরা কি গান্ধীকে তাদের বন্ধু বা সহযোগী বলে স্বীকার করতে পারে ?

৪

গান্ধিজীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী প্রচার ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে। কংগ্রেস পত্রপত্রিকাও তা সমর্থন করেছে। এখানে যে সব থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হল।

১৯৩৯ সালের ১৭ আগস্ট বোম্বাই আইনসভার সদস্য বি. কে. গাইকোয়াড় প্রশ্ন করেন যে, ১৯৩২ সালে গান্ধিজী মন্দির প্রবেশ আন্দোলনের কথা ঘোষণা করার পর কতগুলি মন্দিরদ্বার অস্পৃশ্যদের জন্য মুক্ত করা হয়েছে ? ভারপ্রাপ্ত কংগ্রেসীমন্ত্রী প্রশ্নোত্তরে বললেন— 'এরূপ মন্দিরের সংখ্যা ১৪২। এই ১৪২ টির মধ্যে ১৪১টি ছিল ছিল মালিকবিহীন রাস্তার ধারে পড়ে থাকা অব্যবহৃত মন্দির।' গান্ধিজীর জন্মস্থান গুজরাটের একটি মন্দিরেও অস্পৃশ্যরা প্রবেশাধিকার পায় নি।

গান্ধিজীর গুজরাটী পত্রিকা 'হরিজন বন্ধু'তে ১৯৪০ সালের ১০ মার্চে প্রকাশিত একটি সংবাদ ঃ—

"গুজরাটের কোন স্কুলে এখনো পর্যন্ত অস্পৃশ্যদের প্রবেশ ব্যাপারে কোন প্রয়াস নেওয়া সম্ভব হয় নি।"

১৮৪০ সালের ২৭ আগস্ট 'দি বোম্বে ক্রনিক্যাল' পত্রিকায় হরিজন সেবক সংঘের একটি পত্রের কিছুটা উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয় ঃ—

"আমেদাবাদ জিলার গোধভী অঞ্চলে হরিজনরা তাদের ছেলে-

মেয়েদের 'লোকাল বোর্ডের স্কুলে' পাঠানোর অপরাধে তাদের দেশ ছাড়া করা হয়েছে। ৪২টি হরিজন পরিবারকে গ্রাম ত্যাগ করে সানাদ জিলার তালুকা শহরে আশ্রয় নিতে হয়েছে।"

১৯৪০ সালে ২৭ আগস্ট বোম্বাই প্রেসিডেন্সির থানা মিউনিসিপালিটির প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট তফসিলী নেতা মিঃ এ. এম. নন্দগাঁওকরকে একটি হিন্দু হোটেলে চা পরিবেশন করতে অস্বীকার করা হয়। ঘটনাটি ২৮ আগস্ট 'দি বোম্বে ক্রনিক্যাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে পত্রিকাটিতে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তার কিছুটা এখানে তুলে ধরা হল ঃ—

"যখন গান্ধিজী ১৯৩২ সালে অনশন করেন তখন অনেকগুলি মন্দির ও হোটেলে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি বিপরীত হয়ে দেখা দিয়েছে। সুপরিচ্ছন্ন অস্পৃশ্যদেরও মন্দির বা হোটেলে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এখনো অনেক অস্পৃশ্যতা বিরোধী কর্মীরা বলে থাকেন—'অস্পৃশ্যরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে শিখলে তাদের সামাজিক বিধি-নিষেধ আপনা থেকেই উঠে যাবে।' বর্তমান ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে এই ধরণের কথা একেবারেই অর্থহীন।"

'দি বোম্বে ক্রনিক্যাল' ১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারীতে 'অল ইণ্ডিয়া সিডুল্ড কাস্ট ফেডারেশনের' কানপুর অধিবেশনের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে লিখেছে ঃ—

"হিন্দু সমাজের নিস্পৃহতার ফলে জাতব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার প্রকোপ দিন দিন বেড়ে চলেছে। কিছু কিছু হিন্দু নেতা বৃটিশের স্বার্থপ্রণোদিত বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জাত-ব্যবস্থার গুণকীর্তন করে বলছে, জাতব্যবস্থার মাধ্যমেই হিন্দু সংস্কৃতি আজ পর্যন্ত টিকে আছে। তা না হলে হাজার হাজার বছরের ঝড়-ঝাপটা অতিক্রম করে জাতব্যবস্থা মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারত না। এটা সত্যিই বেদনাদায়ক যে, গান্ধিজী এবং অন্যান্য সমাজ সংস্কারকদের এত চেষ্টা সত্বেও অস্পৃশ্যতা এখনো ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। গ্রামাঞ্চলে তো অস্পৃশ্যতা দাপিয়ে চলেছে। এমন কি বোম্বের মত আন্তর্জাতিক শহরেও কোন পরিচিত জমাদার সে যতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক

পরিহিত হোক না কেন, সে কোন হিন্দু রেস্টুরেণ্টে, এমন কি ইরানী রেস্টুরেণ্টে পর্যন্ত প্রবেশাধিকার পাবে না।"

অস্পৃশ্যরা সর্বদাই বলে আসছে যে, গান্ধিজীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তার দীর্ঘ ২৫ বছরের প্রয়াসের পরও ভারতের প্রায় সর্বত্র অস্পৃশ্যদের কাছে হোটেল বন্ধ, কুঁয়োর জল বন্ধ, মন্দির দ্বার বন্ধ। গুজরাটে তো স্কুল পর্যন্ত বন্ধ। উপরে উল্লিখিত পত্রিকাগুলি থেকে যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলি সবই জনপ্রিয় কংগ্রেসী পত্রিকা থেকে নেওয়া। এ বিষয়ে আর কোন বিতর্কের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। তবে আরো একটি প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন।

গান্ধিজী ব্যর্থ হলেন কেন ? আমার মতে তার ব্যর্থতার কারণ তিনটি। প্রথমতঃ তিনি অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য যে সব উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তারা তাতে সাড়া দেয় নি। কেন সাড়া দেয় নি ? এটা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, আমরা যেসব কথা বলি এবং তার যা ফলাফল দেখা যায় তা সবসময় মেলে না। বক্তার প্রভাব শ্রোতার উপর কতটা প্রতিফলিত হয় তার উপর নির্ভর করে বক্তব্যের ফলোৎপাদনের গতি হয় বেড়ে যায়, না হয় স্তিমিত হয়।

এই রহস্যসূত্র থেকেই আমরা বুঝতে পারব কেন গান্ধিজীর অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত আবেদন বর্ণহিন্দুদের কাছে গ্রহণীয় হয় নি। তারা প্রতিদিন প্রার্থনা সভার পরে গান্ধিজীর উপদেশ বাণী শুনেছে এবং উপসনাগৃহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সব কথা ভুলে গেছে। এজন্য শ্রোতারা যতটা দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী ছিলেন গান্ধিজী নিজে। গান্ধিজী মহাত্মা হয়েছেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত হিসাবে, আধ্যাত্মিক জগতের গুরু হিসাবে নন। তার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন লোকে তাকে রাজনৈতিক সংস্কারক হিসাবেই গ্রহণ করেছে। অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনকে জনসাধারণ তার একটা সখ বলে মনে করেছে। জনসাধারণ তার রাজনৈতিক নির্দেশকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার ধর্মীয় প্রচারকে এক কান দিয়ে শুনেছে এবং অন্য কান দিয়ে বের

করে দিয়েছে। তাই তার অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন জনসাধারণের মনে কোন দাগ কাটতে পারে নি।

প্রকৃতপক্ষে গান্ধিজী ছিলেন 'রাজনীতির জুতো প্রস্তুতকারক'। তার কার্যাবলীকে রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা উচিত ছিল। তার ধারণা ছিল যে, তিনি সামাজিক সমস্যারও সমাধান করতে সক্ষম। ওটাই তার ভুল ধারণা। একজন রাজনীতিবিদ কদাচিৎ সমাজসংস্কারের কাজে সফল হতে পারেন। সে কারণে গান্ধিজী তার নির্দেশ ও বাণীর মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের যে আশা পোষণ করেছিলেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হল গান্ধিজী কখনো বর্ণহিন্দুদের বিরোধিতা করতে চান নি। অথচ অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের জন্য এরূপ বিরোধিতা ছিল অপরিহার্য। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলেই গান্ধিজীর মানসিকতার আসল পরিচয়টা পাওয়া যাবে।

গান্ধিজীর বেশীর ভাগ বন্ধুরা বলেন যে. তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য নিষ্ঠাপূর্ণভাবে কাজ করেছেন। অস্পৃশ্যরা একথা কদাচিৎ বিশ্বাস করে যে, গান্ধিজীর প্রচারের মধ্যে একটুও নিষ্ঠা রয়েছে। রাশি রাশি প্রচারের চেয়ে সামান্যতম কর্মসূচীর মূল্য অনেক বেশী। গান্ধিজী কেন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ বা অনশন করছেন না ? এই প্রশ্ন তুললেই বুঝতে পারা যাবে কেন গান্ধিজী কেবলমাত্র প্রচার-কার্যের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন ?

কেন গান্ধিজী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন নি তার কারণ জানতে হলে ১৯২৯ সালে যখন অস্পৃশ্যরা বোম্বাই প্রেসি-ডেন্সীতে মন্দির প্রবেশ ও সাধারণ জলাশয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সুরু করে তখন গান্ধিজীর ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অস্পৃশ্যরা যখন তাদের আন্দোলনে গান্ধিজীর সমর্থন চান তখন তিনি বলেন যে, তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন কেবলমাত্র বিদেশী দের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে—তা বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা চলবে না। তাহলে বুঝুন সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধিজীর কি অদ্ভূত যুক্তি ! গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন যে একটা রাজ-নৈতিক ধাপ্পা, এই ঘটনা সেটাই আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে

দেখিয়ে দিচ্ছে। আসলে গান্ধিজীর চরিত্রটা হল বর্ণহিন্দুদের তোয়াজ করে চলা।

গান্ধী-চরিত্রের দ্বিতীয় নিদর্শন হল কবিথার ঘটনা। কবিথা হল গুজরাটের আমেদাবাদ জিলার একটি গ্রাম। ১৯৩৫ সালে কবিথা গ্রামের অস্পৃশ্যরা তাদের ছেলেমেয়েদের গ্রামের স্কুল বর্ণহিন্দুদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে পড়াশুনা করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। বর্ণহিন্দুরা এতে ক্ষেপে যায়। তারা অস্পৃশ্যদের উপর বয়কট সুরু করে। এই ঘটনাটির তদন্ত করতে মিঃ এ. ভি. ঠক্কর গিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রদত্ত তার বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ—

"দি এসোসিয়েটেড প্রেস' এক বিবৃতিতে বলে যে, ১০ তারিখে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে অস্পৃশ্যদের এক আপোষ মীমাংসা হিসাবে ঠিক হয় যে, কবিথা গ্রামের স্কুলে উভয় শ্রেণী ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়াশুনা করবে। আমেদাবাদ হরিজন সেবক সংঘের সম্পাদক ১৩ তারিখে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে, অস্পৃশ্যরা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল পাঠাবে না। এই সিদ্ধান্তটি অস্পৃশ্যদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। কারণ উক্ত গ্রামের উচ্চশ্রেণীর গারাসিয়ারা গ্রামের তাঁতি, চামার প্রভৃতি ১০০ অস্পৃশ্য পরিবারের উপর বয়কট আরোপ করে। ফলে অস্পৃশ্যরা ক্ষেতমজুরের কাজ, মাঠে গরু চরানোর কাজ এবং শিশুদের দুধ খাওয়ানো থেকেও বঞ্চিত হয়। অস্পৃশ্য নেতাদের বাধ্য করা হয় যাতে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠায়।

"অস্পৃশ্যরা আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও তাদের উপর ২২ তারিখ পর্যন্ত বয়কট চলতে থাকে। ১৫ ও ১৯ তারিখে অস্পৃশ্যদের পানীয় জলের কুঁয়াতে কেরোসিন ঢেলে দেওয়া হয়। অস্পৃশ্যরা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিল বলে উচ্চবর্ণের গারাসিয়ারা তাদের উপর এরূপ নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল।

"আমি ২২ তারিখে গারাসিয়া নেতাদের সঙ্গে দেখা করি। তারা বলল, তারা কখনো এটা বরদাস্ত করবে না যে, তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে চামার ও ধেড়দের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করবে। আমি

পরের দিন এই সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজার জন্য আমেদাবাদের জিলাশাসকের সঙ্গে দেখা করেও কোন সুরাহা করতে পারি নি।

"এর ফলে অস্পৃশ্য সমাজের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পাঠ কয়েকদিনের মধ্যেই উঠে গেল। কারণ তারা কোন স্থান থেকেই সদর্থক সহায়তা পেল না। শেষ পর্যন্ত তাদের গ্রাম ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হল।"

এই ঘটনার রিপোর্ট গান্ধিজীকে জানান হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কবিথার তফসিলীদের যে উপদেশ তিনি প্রেরণ করেছিলেন তা ১৯৩৫ সালের ৫ অক্টোবর 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ঃ—

"আত্মনির্ভরতাই হল সব চেয়ে বড় সহায়তা। যারা স্বাবলম্বী হয় ভগবানও তাদের সাহায্য করেন। হরিজনরা যদি কবিথা গ্রাম ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই সুখী হতে পারবে। যদি তারা জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য তাদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে পারে, তাহলে তারা হয়ত ভবিষ্যতেও আত্মমর্যাদা লাভ করতে পারবে। আমি আশা করব হরিজনদের শুভার্থীরা তাদের প্রতি বিরূপ কবিথা গ্রাম ত্যাগ করতে তাদের সাহায্য করবে।"

অতএব দেখা গেল অস্পৃশ্যদিগকে তাদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে গান্ধিজী উপদেশ দিলেন। গান্ধিজী কেন ঠক্করকে অস্পৃশ্যদের নাগরিক অধিকার সমর্থন করতে এবং বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে উপদেশ দিলেন না? গান্ধিজী নিশ্চয়ই অস্পৃশ্যদের উন্নতি চান, যদি তাতে বর্ণহিন্দুরা অখুশী না হয়। তার অর্থ গান্ধিজী অত্যাচারী বর্ণহিন্দুদের কাছে ভালমানুষ থাকতে চান। গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক দাবীর বিরোধী ছিলেন; যেহেতু বর্ণহিন্দুদের কাছে তা অভিপ্রেত নয়। তিনি কোন ক্ষেত্রেই বর্ণহিন্দুদের রুষ্ট করতে চান নি। অতএব একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, গান্ধিজীর 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন' ছিল একটা কথার কথা।

তৃতীয়তঃ গান্ধিজী কখনো চান নি যে, অস্পৃশ্যরা সংগঠিত হোক বা নিজেদের পায়ে দাঁড়াক। তাঁর ভয় ছিল তাহলে অস্পৃশ্যরা

স্বাধীনভাবে চলার চেষ্টা করবে এবং তাতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের স্বার্থহানি ঘটবে। তার হরিজন সেবক সংঘ একথার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই সংঘের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অস্পৃশ্যরা যাতে তাদের উচ্চবর্ণের প্রভুদের কাছে ক্রীতদাস হয়ে থাকে। সংঘকে যে কোন দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যাবে যে, তার একমাত্র লক্ষ্য অস্পৃশ্যদের মধ্যে দাসোচিত মনোবৃত্তি গড়ে তোলা।

'হরিজন সেবক সংঘের' কার্যাবলী পর্যালোচনা করতে গিয়ে মহাভারতের একটা কাহিনীর কথা মনে পড়ে। মথুরার রাজা কংস জানতে পারলেন যে, সম্প্রতি কৃষ্ণ নামে একটা শিশু জন্মেছে—যার হাতে তার মৃত্যু হবে। তাই শিশু অবস্থাতেই কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য কংস পুতনা নামক এক রাক্ষসীকে নিয়োগ করলেন। পুতনা একটি সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে শিশুদের তার বুকের দুধ খাইয়ে পুষ্ট করার ব্রতের কথা বলে নন্দরানী যশোদাকে ভুলিয়ে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়েছিল। পুতনার স্তন ছিল বিষ মাখানো। পরের ঘটনা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পুতনার তুলনা করা যেতে পারে 'হরিজন সেবক সংঘের' সাথে, আর কৃষ্ণের তুলনা অস্পৃশ্যদের সাথে।

গোলটেবিল বৈঠকে অস্পৃশ্যদের স্বাধিকারের দাবীতে ভয় পেয়ে যান উচ্চবর্ণের 'এজেন্ট' গান্ধিজী। তাই পুতনার মডেলে 'হরিজন সেবক সংঘ' তৈরী করে অস্পৃশ্যদের স্বাবলম্বিতার প্রয়াস ধ্বংস করতে চেয়েছেন গান্ধিজী। হরিজন সেবক সংঘের দয়ার দানে কতিপয় অস্পৃশ্যকে এজেন্ট করে অস্পৃশ্যদিগকে বর্ণহিন্দু নির্ভর করার তার কৌশলটি আজ সকলে ধরে ফেলেছে। আইরিশ নেতা দানিয়েল বলেছেন—'কোন মানুষ আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কৃতজ্ঞ থাকতে পারে না, কোন নারী সতীত্বের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, কোন দেশ স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কারো কাছে কৃতজ্ঞ হতে পারে না।' তেমনি অস্পৃশ্য সমাজও তাদের স্বতন্ত্র অধিকার বিসর্জন দিয়ে হরিজন সেবক সংঘের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না।

হরিজন সেবক সংঘের সবচেয়ে অনিষ্টকর কাজ হল অস্পৃশ্য

ছাত্রদের জন্য আবাসিক হোষ্টেল। এই হোষ্টেলের ছাত্রদের কথা চিন্তা করলে আমার মহাভারতের 'ভীষ্ম' ও 'কচ' এই দুটি চরিত্রের কথা মনে পড়ে। ভীষ্ম বলতেন, পাণ্ডবেরা ধার্মিক ও কৌরবরা অধার্মিক। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম অধার্মিক কৌরবদের পক্ষে এবং ধার্মিক পাণ্ডবদের বিপক্ষে লড়াই করেছিলেন। কারণস্বরূপ তিনি বলেছিলেন যে, তিনি কৌরবদের অন্ন খেয়েছেন তাই তাকে জেনেশুনেও অধর্মের পক্ষ অবলম্বন করতে হয়েছে।

কচ ছিলেন দেবপুত্র। তিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখতে এসেছিলেন ; কারণ দেবগুরু বৃহস্পতি মৃতদেহ বাঁচাবার মন্ত্র জানতেন না। কচ শুক্রাচার্য কন্যা দেবযানীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তার প্রতিশ্রুতি রাখেন নাই। কারণ স্বরূপ তিনি বলেছিলেন যে, দেবকুলের স্বার্থ তার ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতির চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।

আমার অভিমত অনুসারে ভীষ্ম এবং কচ দুজনেই নীতিভ্রষ্ট। হরিজন সেবক সংঘের হোস্টেলের অস্পৃশ্য ছাত্রেরা ভীষ্ম ও কচের ভূমিকাই পালন করে থাকে। হোষ্টেলে থাকাকালে তারা ভীষ্মের মত গান্ধিজীর কংগ্রেসের গুণকীর্তন করে, যদিও তারা জানে যে ওরা মতলববাজ। যখন তারা হোষ্টেল ছেড়ে আসে তখন তারা কচের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং গান্ধিজী ও কংগ্রেসের নিন্দা করতে থাকে। এই ভাবে অস্পৃশ্য সমাজের ছাত্রদের মানসিক চরিত্র কলুষিত করাই হল হরিজন সেবক সংঘের অন্যতম কাজ।

চতুর্থতঃ সংঘ চালায় বর্ণহিন্দুরা। কিছু কিছু অস্পৃশ্যরা দাবী করে যে সংঘ অস্পৃশ্যদেরই চালান উচিত। কেউ কেউ দাবী করে যে, সংঘের পরিচালক বোর্ডে অস্পৃশ্যদের কিছু প্রতিনিধি থাকা সমীচীন। গান্ধিজী এসব দাবী অতি সুকৌশলে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন—হরিজন সেবক সংঘ হল বর্ণহিন্দুদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ। তারা এতকাল অস্পৃশ্য সমাজকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে যে পাপ করেছে হরিজন সেবক সংঘ পরিচালনা করে তারা তার প্রায়শ্চিত্ত করবে। অতএব সংঘ পরিচালনায় অস্পৃশ্যরা অংশ গ্রহণ করতে

পারবে না। আবার যেহেতু সংঘ পরিচালনার যাবতীয় অর্থ বর্ণ-হিন্দুরা দিচ্ছে সেহেতু সংঘের পরিচালক বোর্ডে অস্পৃশ্যদের কোন অধিকার থাকতে পারে না।

গান্ধিজীর অস্বীকৃতি হয়ত সহ্য করা যেতে পারে; কিন্তু তার প্রদত্ত যুক্তি যে কোন আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন ব্যক্তির কাছেই অপমান-জনক বলে মনে হবে। যে কোন হোষ্টেলে যারা থাকবে পরিচালন ব্যাপারে তাদের বক্তব্য থাকবে না এটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। কোন আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন অস্পৃশ্য সমাজের মানুষ অন্যের দয়ায় উপর নির্ভর করা কোনক্রমেই মেনে নিতে পারে না। একথা বলতেই হবে যে, নীচতা যদি একটা মানবিক গুণ হয় তবে সে গুণের প্রমুখ অধিকারী হলেন গান্ধিজী। তাই যদি কোন অস্পৃশ্য সমাজের মানুষ হরিজন সেবক সংঘকে বয়কট করে সেজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

সংঘ পরিচালনার আসল রহস্যটি ভিন্নরূপ। একবার যদি সংঘ তফসিলীদের পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা আর কংগেস বা গান্ধিজীর করায়ত্বে থাকবে না। অস্পৃশ্যরা তখন বর্ণহিন্দুদের কবল থেকে বেরিয়ে যাবে। তারপর অস্পৃশ্যরা যদি স্বাধীন হয়ে যায়, তবে তারা আর বর্ণহিন্দুদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে না। গান্ধিজীর হরিজন সেবক সংঘ গঠনের উদ্দেশ্যটাই হল অস্পৃশ্যদের স্বাবলম্বি-তার পরিপন্হী। হরিজন সেবক সংঘের দ্বারা তিনি খৃষ্টান মিশনারী-দের 'স্কুল কম্পাউণ্ড মেণ্টালিটি' অস্পৃশ্য সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এই কারণেই হরিজন সেবক সংঘের উপর গান্ধিজী তার পূর্ণ কর্তৃত্ব বাজায় রাখতে চান। এটা কি কোন অস্পৃশ্যদরদী ব্যক্তির মনোবৃত্তি হতে পারে ? তাই গান্ধিজীকে কোনপ্রকারেই অস্পৃশ্যদের মুক্তিদাতা বলে মেনে নেওয়া যায় না।

এই সব কারণেই গান্ধিজীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৫

উপসংহারে একথা কি বলা যেতে পারে যে, অস্পৃশ্যরা তাদের যে

মানবিক অধিকারসমূহ থেকে হাজার হাজার বছর বঞ্চিত রয়েছে গান্ধিজী তার কতটা অর্জন করে দিতে পেরেছেন ? কিছুই পারেন নি । তাদের মানবিক অধিকার এখনো বর্ণহিন্দুদের হাতের মুঠোয় । তিনি তার এতটুকুও উদ্ধার করতে পারেন নি । পরন্তু তিনি অস্পৃশ্যদের মানবিক অধিকার অর্জনের পথে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করেছেন । আজ অস্পৃশ্যরা বুঝতে পেরেছে যে, তাদের অপহৃত মানবিক অধিকার কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমেই তারা ফিরে পেতে পারে, অন্য কোন পন্থায় নয় ।

গান্ধিজী মনে করেন যে, তার প্রচার এবং বর্ণহিন্দুদের বদান্যতা ও শুভেচ্ছাতেই অস্পৃশ্যরা তাদের হারানো মানবিক অধিকার ফিরে পেতে পারে অস্পৃশ্যরা কি চিরকাল বর্ণহিন্দুদের বদান্যতা ও শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে থাকতে পারে ? বদান্যতা ও শুভেচ্ছার ধারা কতকাল প্রবাহিত থাকতে পারে ? অস্পৃশ্যতা দু'হাজার বছর ধরে এদেশে রয়েছে । এই দীর্ঘকাল ধরে বর্ণহিন্দুরা অস্পৃশ্যদের শোষণ করে তাদের হাড়-মজ্জা পর্যন্ত ঝরঝরে করে দিয়েছে । তারা অস্পৃশ্যদিগকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে । দুহাজার বছর ধরে বর্ণহিন্দুদের বদান্যতা ও শুভেচ্ছা কোথায় ছিল ? গান্ধিজী তার ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ১২ বছর ঘুরে ঘুরে ৮ কোটি অস্পৃশ্যদের জন্য ৮ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছেন । তাই গান্ধিজীর প্রতি এই চ্যালেঞ্জ জানান হচ্ছে যে, প্রশাসনিক ক্ষমতা এক বছরে অস্পৃশ্যদের যে উন্নয়ণমূলক কাজ করতে পারে গান্ধিজীর হরিজন সেবক সংঘের মত অত্যুৎসাহী ভিখারীর দল এক'শ বছরেও তা করতে পারে না । কিন্তু গান্ধিজীর কাছে অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার হল একটা মারাত্মক ক্ষতিকর বিষয়। এখন 'গান্ধিজী সম্পর্কে সাবধান !' কথাটি উচ্চারণ করা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ? বিগত ২৫ বছর ধরে গান্ধিজী ভালই উপলব্ধি করেছেন যে. অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতি ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তার সামাজিক প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে । তৎসত্ত্বেও যদি তিনি অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরোধী হন তাহলে তার সম্পর্কে এর চেয়ে আর কি সাবধান বাণী উচ্চারণ করা যেতে পারে ?

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকনের মনোভাব স্মরণ করা যেতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট ও দাসপ্রথা সম্পর্কে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ হোরেস গ্রীলের এবং আব্রাহাম লিংকনের পত্রালাপের মধ্যে যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছিল তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রেসিডেণ্টের কাছে '২ কোটি নাগরিকের আবেদন' নামে যে পত্রটি মিঃ গ্রীলে পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি লেখেন ঃ—

"মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আমেরিকার ঐক্য যাদের পক্ষে একান্ত কাম্য তাদের পক্ষে একই সঙ্গে বিদ্রোহ দমন ও বিদ্রোহের মূল কারণ দাস প্রথাকে সমর্থন বিভ্রান্তিকর।"

প্রেসিডেণ্ট লিংকন উত্তরে জানালেন ঃ—

"যারা দাসপ্রথা ও আমেরিকার ঐক্য একসঙ্গে রক্ষা করতে চান আমি তাদের সঙ্গে একমত নই।

"যারা দাসপ্রথা ধ্বংস না করে আমেরিকার ঐক্য চান না আমি তাদের সঙ্গেও একমত নই।

"আমার লক্ষ্য হল, আমেরিকার ঐক্যকে রক্ষা করা। তার সঙ্গে দাসপ্রথা রক্ষা করা বা উচ্ছেদ করার কোন সম্পর্ক নেই।

"যদি একজন ক্রীতদাসকেও মুক্ত না করে আমি আমেরিকার ঐক্য রক্ষা করতে পারি, তাই করব ; আর যদি সমস্ত ক্রীতদাসকে মুক্ত করে আমি দেশের ঐক্য রক্ষা করতে পারি, তাই করব ; অথবা যদি কিছু সংখ্যক ক্রীতদাসকে মুক্ত করে এবং কিছু সংখ্যককে যেমন আছে তেমনি রেখে দেশের ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব হয়, আমি তাই করব।"

আমেরিকার ঐক্যের প্রশ্নে নিগ্রোদের ক্রীতদাসত্ব সম্পর্কে এটাই ছিল প্রেসিডেণ্ট লিংকনের অভিমত। নিগ্রোদের দাসত্ব মুক্তির জন্য যিনি প্রসিদ্ধ এই কথা তার চরিত্রের উপর হয়ত ভিন্নতর আলোকপাত করবে। তিনি নিগ্রোদের দাসত্ব মুক্তিকে মুখ্য করে দেখেন নি। 'জনগণ কর্তৃক, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার' এই বিখ্যাত মতবাদের জনকের উপরের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সাদা জনগণের জন্য, কালো নিগ্রোদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি কিছু মনে করবেন না যদি তাতে দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

গান্ধিজীর স্বরাজ এবং অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত ধারণাটিও দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের নিগ্রোদের দাসত্ব মুক্তি ও আমেরিকার ঐক্য সম্পর্কিত ধারণারই অনুরূপ। গান্ধিজী চেয়েছেন স্বরাজ আর লিঙ্কন চেয়েছেন ঐক্য। কিন্তু স্বরাজ লাভের জন্য হিন্দুসমাজের কাঠামোটি ভেঙ্গে যাক এটা গান্ধিজী চান নি ; অথচ এই সামাজিক কাঠামোটা ভাঙ্গাই ছিল অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন কিন্তু ঐক্যের জন্য প্রয়োজন না হলে নিগ্রোদের দাসত্বমুক্তিকে অপরিহার্য বলে মনে করেন নি। এটাই হল আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে গান্ধিজীর পার্থক্য। প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন আমেরিকার ঐক্যের জন্য প্রয়োজন হলে নিগ্রোদের দাসত্ব মুক্তি আবশ্যিক বলে মনে করেছিলেন। গান্ধিজী কিন্তু স্বরাজ লাভের জন্য প্রয়োজন হলেও অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক মুক্তিকে মেনে নিতে পারেন নি। এটাই লিঙ্কনের সঙ্গে গান্ধিজীর মনোবৃত্তির পার্থক্য। গান্ধিজীর অভিমত হল, স্বরাজ পিছিয়ে যেতে পারে ; তাই বলে অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক মুক্তি কখনো স্বীকার করা যাবে না।

অস্পৃশ্য সমাজের কেউ কেউ ভাবছেন যে. গান্ধিজী যখন পুনা-চুক্তি মেনে নিয়েছেন তখন তিনি অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। এটা একেবারেই ভুল ধারণা। পুনা-চুক্তির অংশীদার হলেও তিনি গোলটেবিল বৈঠকে অস্পৃশ্যদের প্রতি যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন তার থেকে এতটুকুও সরে যান নি। প্রমাণ স্বরূপ ১৯৪০ সালের ১৩ অক্টোবরের 'হরিজন' পত্রিকা দ্রষ্টব্য। ১৯৪০ সালে বৃটিশ সরকার যখন ভারতের অস্পৃশ্যদিগকে পৃথক রাজনৈতিক সত্তা বলে ঘোষণা করলেন, গান্ধিজী তখন প্রতিবাদে বৈঠক ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন। ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিনলিথগো যখন বললেন, যেহেতু অস্পৃশ্যরা ভারতের জাতীয় জীবনের একটা পৃথক সত্তা সেহেতু নূতন সংবিধানে তাদের সম্মতি অবশ্যই প্রয়োজন। তখন গান্ধিজী তার যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তা ১৯৪০ সালের ১৩ অক্টোবর 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে গান্ধিজীর বক্তব্যের কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ—

"আমি অনুভব করছি যে, ভারতসচিব এবং বড়লাট যে কথা বলেছেন যে, কংগ্রেস যেহেতু রাজন্যবর্গ, মুসলিম লীগ ও তফসিলী-দের সঙ্গে একমত হচ্ছে না সেহেতু তা বৃটিশরাজ কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা দানের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা কংগ্রেস এবং ভারতভাসীর কাছে যৎপরোনাস্তি অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে।

"ভারতের স্বাধীনতা দানের ক্ষেত্রে তফসিলীদের প্রশ্ন উত্থাপন করা বৃটিশ সরকারের পক্ষে একটা একান্ত বাজে অজুহাত মাত্র। তারা একথা ভালই জানে যে, কংগ্রেস তফসিলীদের স্বার্থ সম্পর্কে সর্বদাই সজাগ এবং বৃটিশ সরকারের চেয়ে কংগ্রেস তাদের স্বার্থ যথেষ্ট ভালভাবেই রক্ষা করতে পারবে। আবার তফসিলী শ্রেণী-সমূহ হিন্দুদের মত অনেক জাতিতে বিভক্ত। তাই কোন তফসিলী জাতি সমস্ত তফসিলী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।"

গান্ধিজী যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তা বালসুলভ। এখানে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বড়লাটের তফসিলী সম্পর্কিত অভিমতের তিনি বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন যে, তফসিলীরা অনেক জাতিতে বিভক্ত, তাই কোন একটি জাতির পক্ষে সামগ্রিকভাবে তফসিলীদের প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়। গান্ধিজী কি জানেন না যে, ভারতের মুসলিম ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। মুসলমানদের তিনটি প্রধান বিভাগ আছে—(১) শিয়া, (২) সুন্নি ও (৩) মোমিন। তারা একত্রে খাওয়া-দাওয়া করলেও তাদের মধ্যে বিয়ে সাদী হয় না।

ভারতীয় খৃষ্টানরাও নানাভাগে বিভক্ত। তারা প্রধানতঃ (১) ক্যাথলিক ও (২) প্রোটেস্টাণ্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত হলেও ক্যাথলিকরা আবার দুভাগে বিভক্ত—যথা (১) কাস্ট খৃষ্টান ও (২) ননকাস্ট খৃষ্টান। তারা একত্রে খাওয়া-দাওয়াও করে না, বা একই গির্জাতে উপাসনাও করতে যায় না। এসব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে. পুনা প্যাক্টের শরিক হওয়া সত্ত্বেও গান্ধিজী তফসিলীদের পৃথক সত্তা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং এজন্য তিনি যে কোন ধরণের অবান্তর যুক্তি উপস্থাপন করে যাচ্ছেন।

উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, গান্ধিজী এখনো

অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তিনি এ বিষয়ে পুনরায় খুঁচিয়ে ঘা করতে চান। তাকে বিশ্বাস করার মত দিন এখনো আসে নি। তাই অস্পৃশ্যদিগকে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে হলে একথাই তাদের বলতে হবে যে—"গান্ধিজী সম্পর্কে সাবধান !"